২.৫. দণ্ডনীতি প্রসঙ্গে কৌটিল্য (Kautilya on Dandaniti)

ভূমিকা : প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এক লক্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী রচনা। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মনুস্মৃতিতে ভারতের রাজনৈতিক-আইনি চিন্তা ও কর্মের সূত্র হিসেবে তাৎপর্য পেয়েছে ধর্মবোধ এবং নৈতিক শৃঙ্খলা। অর্থশাস্ত্রে ধর্মের প্রতি ভক্তি বা সত্যের প্রতি প্রবল আস্থা সত্ত্বেও ব্যাবহারিক উপযোগ বা উপকারের ধারণাটিই রাজনীতির নির্ধারক ভিত্তি বা প্রধান নীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা রাজার প্রয়োজন কেন এ বিষয়ে প্রচলিত দৈবিক ব্যাখ্যা অনুসরণ না করে কৌটিল্য পেশ করেছেন রাষ্ট্র তথা রাজ্যশাসনের প্রয়োজন বা উপকারের এক তত্ত্ব। অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ দর্শনের জিজ্ঞাসা বা সত্য বিচার পদ্ধতি, তিন বেদের ধর্মাধর্মের শিক্ষা ও ভর্তার (অর্থনীতি) লাভ-ক্ষতির অঙ্ক থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে রাষ্ট্রশাসন তথা দণ্ডনীতির বিজ্ঞান। **কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি এক অর্থে দণ্ডনীতির সফল কলা-কৌশল ও প্রয়োগের এক বিদ্যা।** রাষ্ট্র কেমন হবে এ প্রশ্নে কৌটিল্যের তেমন আগ্রহ ছিল না, যতটা তাঁর আগ্রহ ছিল কীভাবে রাষ্ট্রকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা যাবে। দণ্ডনীতিই তাঁর সফল রাষ্ট্রশাসনের মানদণ্ড। কৌটিল্যের কথায় রাজদণ্ড (Sceptre) অর্থাৎ রাজশক্তিই অন্যসব শাস্ত্রের গুণ ও অগ্রগতির সূত্র। দণ্ডনীতি হল শাস্তির আইন বা রাষ্ট্র পরিচালনার বিজ্ঞান। দণ্ডনীতি বা রাজনীতি সফল বা কার্যকরভাবে দণ্ডধারণের নীতি বা কৌশল।

রাষ্ট্র সম্পর্কে এই উপযোগিতা বা উপকারের তত্ত্বটি বা সোজা কথায় দণ্ডনীতির অপরিহার্যতার ধারণাটি প্রচারের ক্ষেত্রে কৌটিল্য সম্ভবত সমকালীন ভারতবর্ষের ক্ষমতার লড়াই ও ক্রমবর্ধমান অরাজক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, কেমন করে জনপদ ও মানুষের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা সম্ভব, কী কৌশলে পার্থিব লাভ বা বৃদ্ধি সম্ভব, সেই কলা বা বিদ্যাটিকেই আয়ত্ত করার পদ্ধতিটি পেশ করতে চেয়েছেন কৌটিল্য। **'দণ্ডনীতি' রাজা চন্দ্রগুপ্তের কাছে তাঁর মহামন্ত্রী কৌটিল্যের দেশরক্ষা, শাসন পরিচালনা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে কিছু অমূল্য উপদেশ।** ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা ইত্যাদি লক্ষ্য ও পন্থা উভয়েরই সত্যাসত্য বিচার করতে চেয়েছে তাদের পবিত্র আইন ধর্মের সাহায্যে। অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা কৌটিল্য পন্থা নিয়ে আগ্রহী নন, লক্ষ্যসাধনই

তাঁর বিচারে আসল কথা। দণ্ডনীতিকে কৌটিল্য পেশ করেছেন ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের এক বাস্তব পথপ্রদর্শক হিসেবে (as a practical guide for the pursuit and exercise of power)। ঠান্ডা মাথায়, রূঢ় বাস্তববাদী দৃষ্টি নিয়ে দমনপীড়নের পক্ষে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ ও শক্তিকে সুসংহত করার এমন সুবিধাবাদী নীতি বা কৌশল তেমন একটা চোখে পড়ে না। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনে ম্যাকিয়াভেলি যেন এরকমই একটি ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন। রাষ্ট্রকে ধর্ম বা নীতি দিয়ে নয়, রাষ্ট্রশাসনের, রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ করার লক্ষ্য নিয়ে প্রাচীন ভারতের কৌটিল্যের মতোই অগ্রসর হয়েছেন পাশ্চাত্যের ম্যাকিয়াভেলি।

তবে ম্যাকিয়াভেলি যেমন নীতির প্রবক্তা ছিলেন না বা নীতিহীনও ছিলেন না, নীতির প্রতি উদাসীন ছিলেন মাত্র, কৌটিল্যের মধ্যে ঠিক সেই ধরনের নৈতিক উদাসীনতা ছিল না। কৌটিল্যের ভাবনায় পাশ্চাত্যের উন্নত সভ্যতার গর্বের ছোঁয়া যেমন ছিল না আবার তেমনি পাশ্চাত্যের রাজনীতি চিন্তার বিমূর্ত ও দুরূহ ধারণাও ছিল না। সমকালের ভারতীয় ঋষিদের মতোই কৌটিল্য ভারতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন এবং অবশ্যই ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে তিনি হিন্দু ঐতিহ্যকেই বুঝেছেন। এই হিন্দু ঐতিহ্য যখন সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে বিপর্যস্ত তখন তাকে বাঁচাতেই তাঁর রাষ্ট্র ধারণার অবতারণা। দেশের ভেতরকার অরাজক ও প্রতিকূল শক্তির তাপে দেশ যখন দগ্ধ, বুদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের প্রভাবে যখন হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য দলিত ও আহত, বহিরাগত পারসিক ও হেলেনীয় যাযাবরের আক্রমণে যখন ভারতভূমি ও তার সংস্কৃতি বিপন্ন তখন কৌটিল্য এই সংকটাপন্ন, বিপন্ন, ভেঙে পড়া ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিলেন। তাঁর অর্থশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি তথা দণ্ডনীতির ধারণাকে সামনে রেখেই তিনি প্রচার করলেন এক ঐক্যবদ্ধ সংহত ভারত নির্মাণের কথা। নীতিকথা নয়, ভারতের অর্থনীতিকে পেশ করলেন তিনি। এই অর্থনীতি হল এক ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ সমাজনীতি তথা রাজনীতির কথা; একটি অখণ্ড, কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনের নিপুণ পরিচালনায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার কথা।

দণ্ডনীতিকে কৌটিল্য **তিনটি অর্থে** বিচার করেছেন : (১) রাজদণ্ড অর্থাৎ রাজা কেমন করে দণ্ডধারণ করে দেশকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে পারেন; (২) শাস্তি বিধানের নীতি ও পদ্ধতি—এক্ষেত্রে প্রধানত আর্থিক নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধ দমনের পন্থা ও কৌশলগুলি লক্ষণীয়; (৩) সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস, পরিচালনা ও সফল প্রয়োগ—এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এক শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে দণ্ডের প্রতীক সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণতাদানের কথা ভেবেছেন কৌটিল্য।

১. রাজদণ্ড : দণ্ডধারী হিসেবে রাজার কর্তব্য কী এ প্রশ্ন বিচার করার আগে কৌটিল্য দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য কী সে কথা বলেছেন। কৌটিল্য বলেছেন দণ্ডনীতি হল অলব্ধ বস্তুকে লাভ করার উপায়, লব্ধ বস্তুকে সুরক্ষিত করার পন্থা, সুরক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করার এবং যা বৃদ্ধি পায় তাকে সঠিকভাবে উপযুক্ত লোকের মধ্যে বণ্টন করার নীতি। দণ্ডনীতিই বিশ্বের প্রগতির পথ, মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সঠিক ও সুঠাম পথ।[৪২]

কৌটিল্য পূর্ব আচার্যের এই অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন যে দণ্ড ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়েই মানুষকে বশে আনা যায় না। দণ্ডকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেই (উদয়তদণ্ড) বিশ্বে প্রগতি কায়েম করা যেতে পারে, মানুষকে নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে এ শিক্ষা কৌটিল্যের মতে অনুকরণীয় নয়। কারণ, কৌটিল্যের বিশ্বাস সব দণ্ডনীতিই সার্থক হয় না। যিনি কঠোর দণ্ডী অর্থাৎ অল্প অপরাধেই কঠিন শাস্তি দেন তিনি ভীতি ও উদ্বেগের কারণ। আবার যিনি মৃদুদণ্ড অর্থাৎ মহা অপরাধেও কম সাজা দেন, তিনি ঘৃণার যোগ্য। যিনি প্রকৃত দণ্ডধারী অর্থাৎ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে সাজা দেন তিনিই সকলের সম্মান লাভ করেন। সুতরাং রাজাকে বিশেষ বিবেচনা করেই দণ্ড প্রয়োগ করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হলে প্রজারা ধর্মের পথে পরিচালিত হতে পারে, অর্থ ও কামনাকে স্ববশে আনতে পারে। অন্যদিকে লোভ আর ক্রোধের বশে যে দণ্ড প্রযুক্ত হয় তা গৃহস্থদের তো বটেই, বাণপ্রস্থ ও পরিব্রাজকদেরও ক্রোধ উৎপাদন করে। আর দণ্ড যদি অপ্রণীত থাকে তাহলে মাৎস্যন্যায়ের আবির্ভাব হয়[৪৩]। ছোটো মাছকে বড়ো মাছের গিলে ফেলার মতো, দণ্ডের অনুপস্থিতিতে সবল দুর্বলকে গ্রাস করে। দণ্ডের নিরাপত্তা পেলেই দুর্বলেরা সবলকে প্রতিরোধ করতে পারে।

কৌটিল্য রাজদণ্ডের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন, রাজা যখন তাঁর দণ্ড নিয়ে মানুষকে পরিচালনা করবেন তখন চার বর্ণ ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থা সুরক্ষিত হবে। দণ্ডই রাজাকে স্বধর্মে পরিচালিত করে। মানুষের মধ্যে দুষ্টশক্তি বর্তমান, দণ্ডই তাকে সংযত করে, সঠিক পথে পরিচালনা করে। রাজার প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিনয়, শক্তি সব কিছুরই উৎস দণ্ড। দণ্ডই তাঁকে আত্মবান করে অর্থাৎ তাঁর গুণসম্পদে সমৃদ্ধ করে। দণ্ড রাজার উত্থানগুণেরও শক্তি। উত্থানগুণ হল রাজার কর্মশক্তি, কার্যসম্পাদনের তৎপরতা। কৌটিল্যের মতে ধর্ম সমাজবিন্যাস ও শৃঙ্খলার শক্তিও বটে, তবে দণ্ডই প্রধান শক্তি। মনু বলেছেন দণ্ড ব্রহ্মার তেজ নিয়ে উপস্থিত, দণ্ড ব্রহ্মারই সৃষ্টি, ধর্মকে রক্ষার জন্যই ব্রহ্মা দণ্ডকে প্রেরণ করেছেন। দণ্ড হল নিশীথ রাতের প্রহরী, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে দণ্ড তখন জেগে থাকে। কৌটিল্যের তত্ত্বে দণ্ড কোনো অলৌকিক শক্তি হিসেবে হাজির নয়, দণ্ডকে তিনি উপস্থিত করেছেন রাজার, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির শক্তি হিসেবে, প্রজা শাসন ও কল্যাণের পন্থা হিসেবে। যে রাজকীয় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমকতাকে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার প্রতীক হল দণ্ড।

২. শাস্তির নীতি ও কৌশল : কৌটিল্যের মতে দণ্ডনীতি সূক্ষ্ম অর্থে শাস্তিবিধানের নীতি ও পদ্ধতি। প্রশাসনিক কাজকর্ম যাদের হাতে যেমনভাবে বণ্টন করা হবে তারা যাতে সেই কাজকর্ম সঠিকভাবে, নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেন দণ্ডধারী রাজাকে সে দিকে কঠোর দৃষ্টি দেবার পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। যে সুগঠিত পরিষদের সাহায্যে রাজা তাঁর কাজকর্ম পরিচালনা করবেন সেই পরিষদের আলাপ-আলোচনার গোপনীয়তা বজায় রাখতে রাজাকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, কোনো রকম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য। রাষ্ট্রদূত, রাজস্ব আদায়কারী, হিসাবরক্ষক, সরকারি তত্ত্বাবধায়ক, বনাঞ্চল সংরক্ষক, অন্তপাল, দুর্গপাল, সান্নিধাতা (যিনি কোশ, দুর্গ, ব্যাবসা, শস্যভাণ্ডার, দেবালয়, অস্ত্রাগার ও বন্দিশালা নির্মাণের তদারকি করেন), দৌবারিক, প্রদেষ্টা, ব্যাবহারিক (নথিপত্র রক্ষক) বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষ, পদাতিকবাহিনী, হস্তিবাহিনী, অশ্ববাহিনী ও রথবাহিনীর প্রধান, প্রশাস্তা, সমাহর্তা সকল কর্মচারীদেরই তাঁদের কৃতকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পুরস্কার ও শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকবে বলে কৌটিল্য ঘোষণা করেছেন।

সন্দেহ নেই ক্রমবর্ধমান জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থার আর্থিক চাহিদা মেটাতে, অসামাজিক কাজকর্মের হাত থেকে রাষ্ট্র এবং প্রজাদের রক্ষা করতে এবং প্রশাসনের উপর একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই কঠিন আইন ও কড়া শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা রেখেছেন কৌটিল্য। সামগ্রিকভাবে আমলাদের কাজকর্ম তদারকি, দক্ষভাবে সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা এবং বিভেদ ও নিপীড়নের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য কৌটিল্য তাঁর আইন ও ন্যায়বিচারের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কৌটিল্য বলেছেন ব্যবহার নির্ণয়ে রাজাই হলেন শ্রেষ্ঠ অধিকারী। তবে বিচার বিষয়ে অর্থ নির্ণয়ের জন্য তিনি তিনজন ধর্মস্থের সহায়তা গ্রহণ করেন। এঁরাও আবার ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতজনের উপদেশ নিয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রে সংগ্রহণ খার্বটিক, দ্রোণমুখ ও স্থানীয় অর্থাৎ দশটি গ্রাম, দুইশত গ্রাম, চারশত গ্রাম এবং আটশত গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বিচারালয় সংগঠিত হবে। এখানেই অপরাধ বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।

দেওয়ানি ব্যবহারবিধি ও ফৌজদারি ব্যবহারবিধি বিষয়ে কৌটিল্যের ধারণা থেকে অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রের দণ্ডবিধির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অধিকরণে কৌটিল্য এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে অর্থশাস্ত্রের সর্বত্রই আইন ও অপরাধ বিষয়ে কৌতূহলপ্রদ আলোচনা আছে। দণ্ডনীতি অর্থাৎ অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেতে গেলে এইসব অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

দেওয়ানি ব্যবহারবিধি এবং ফৌজদারি বিচার প্রসঙ্গে কৌটিল্যের ভাবনা বা সুপারিশ কী ছিল সে সম্পর্কে আলোচনার আগে অপরাধ ও শাস্তি বিষয়ে কৌটিল্যের মতামত সম্পর্কে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। **কৌটিল্য রাজকর্মচারীদের অন্যায়, অপরাধ সম্পর্কে রাজাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে**

বলেছেন। কৌটিল্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কোশ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ বিষয়ে এবং এক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট ভাবনা 'কোশ পূর্বাঃ সর্বারম্ভা' অর্থাৎ রাজাকে স্মরণে রাখতে হবে সব কাজই কোষের উপর নির্ভর করে। যাতে কোশ বৃদ্ধি হয় এবং অল্প কোশক্ষয়ও না ঘটে রাজা সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। যে ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী কোশবৃদ্ধির কারণ ঘটাবেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করবেন, দুর্ভিক্ষের অনুপস্থিতি, কর ফাঁকি রোধ এবং নানাভাবে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটাবেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যে-কোনো ধরনের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, গরমিল, রাজস্ব ক্ষতি, রাজস্ব অপহরণ, অন্যায়ভাবে রাজস্ব উপভোগের বিরুদ্ধে থাকবে কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা।

কোশের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও রাজকর্মচারীদের রাজার্থ অপহরণ ও আত্মসাৎ সম্পর্কে কৌটিল্য কয়েকটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। কৌটিল্য এটা ভালোভাবেই জানতেন যেসব রাজকর্মচারী রাজকীয় অর্থবিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তারা গোপনে স্বল্প পরিমাণে হলেও রাজার্থ আস্বাদন না করে থাকতে পারে না। কৌটিল্য বলেছেন কোনো ব্যক্তির জিভের তলে মধু বা বিষ ঢেলে দিলে সে যেমন তার আস্বাদন না করে থাকতে পারে না, তেমনি রাজার্থ বিষয়ে নিযুক্ত কর্মচারী স্বল্প হলেও রাজার্থ ভোগ বা আস্বাদন না করে থাকতে পারে না। কৌটিল্য আরও বলেছেন জলের মাছ জল খাচ্ছে কিনা এটা যেমন বোঝা সম্ভব নয় তেমনি রাজকর্মচারী সরকারি তহবিল তছরুপ করছেন কিনা তা জানা সম্ভব নয়। পাখি কত উপরে উড়ছে তা জানা সম্ভব কিন্তু গোপন কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের গতিবিধি জানা মোটেই সম্ভব নয়।

তহবিল তছরুপের বিরুদ্ধে কৌটিল্য কঠিন শাস্তির সুপারিশ করেছেন। তিনি চল্লিশ রকমের তহবিল তছরুপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হল : অর্থ আগে আদায় হয়েছে অথচ হিসাব পুস্তকে পরে তালিকাভুক্ত হয়েছে; অর্থ আদায় করা উচিত ছিল অথচ আদায় করা হয়নি; অনাদায়ী অর্থ আদায় হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে; আদায় করা হয়েছে অথচ দেখানো হয়েছে তা আদায় করা হয়নি; সংগৃহীত অর্থ সংগৃহীত হয়নি বলে দেখানো হয়েছে, আবার সংগৃহীত হয়নি এমন অর্থ সংগৃহীত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে; যে অর্থ আদায় বা সংগ্রহ করার কথা ছিল তার পুরোটা আদায় হয়নি বা দেখানো হয়েছে অংশত আদায় করা হয়েছে বলে; সংগৃহীত অর্থকে সঠিকভাবে দেখানো হয়নি; এক উৎস থেকে প্রাপ্য অর্থ অন্য উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে; যে অর্থ প্রদান করার কথা ছিল তা প্রদান করা হয়নি বা যে অর্থ প্রদান করার কথা নয় তা প্রদান করা হয়েছে; সময় মতো অর্থ প্রদান করা হয়নি বা অনিয়মিতভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে; ছোটো দানকে বড়ো দান বা বড়ো দানকে ছোটো দান হিসেবে দেখানো হয়েছে; অর্থ কোশ থেকে দেওয়া হয়েছে অথচ তা তালিকাভুক্ত করা হয়নি; অল্প মূল্যের দ্রব্যকে বেশি মূল্যে বিনিময় করা হয়েছে বা বেশি মূল্যের দ্রব্যকে কম মূল্যে বিনিময় করা হয়েছে; দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা কমানো হয়েছে; দিন-রাত্রির সময়ের হিসাব রাখা হয়নি; বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি; আয়ের সূত্র সঠিকভাবে পেশ করা হয়নি; দ্রব্যের মান, সংখ্যা ইত্যাদি বিচার বা গণনার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি।

কৌটিল্যের বক্তব্য কোশ আত্মসাৎ বা গরমিলের কাজে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে অপরাধের মাত্রা অনুসারে সাজা দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোশাধ্যক্ষ, নিবন্ধক, প্রতিগ্রাহক, দায়ক, দ্বাপক, মন্ত্রীর কর্মচারী সকলেরই অপরাধ বিচার করা হবে। কৌটিল্য এরকম একটি প্রচারও জনসমক্ষে করতে বলেন 'কোশ আত্মসাতের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তির অপরাধে যদি কোনো প্রজা ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে তিনি রাজার কাছে প্রতিকারের আবেদন জানাবেন।' রাজা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

শুধু কোশের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীই নয়, কৌটিল্য প্রতিটি বিভগের সঙ্গে যুক্ত রাজকর্মচারীর কাজকর্ম পরীক্ষা করতে বলেছেন। সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিয়োগ, কর্মচারীর প্রতিদিনের কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য এবং এ ব্যাপারে রাজাকে গুপ্তচরের সহায়তা নিতে বলেছেন। কার্য পরিদর্শকের উপর প্রতিটি বিভাগের কাজকর্ম তদারকির দায়িত্ব দেওয়া এবং প্রতিটি বিভাগের কাজকর্ম, ভুলত্রুটি, অন্তর্ঘাত সম্পর্কে খোঁজ রাখার জন্য রাজাকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন কৌটিল্য। বেহিসাবি, অমিতব্যয়ী, কৃপণ সব ধরনের মানুষ যাদের জন্য কোশের

ক্ষতি হয় তাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের সুপারিশ করেছেন তিনি। অর্থ মজুত, অর্থের চালান দেওয়াকেও অন্যায় অপরাধ বলে গণ্য করেছেন তিনি। কৌটিল্য রাজকর্মচারীদের সততার প্রতি দৃষ্টি রেখেই, রাষ্ট্রের অর্থ বৃদ্ধিতে তাঁরা কতটা যত্নশীল একথা মনে রেখেই তাদের কাজে স্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। কৌটিল্য যথার্থই বলেছেন কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর অধ্যক্ষদের স্বভাব দোষগ্রস্ত হতে পারে এটা ভেবেই আগে থেকেই তাঁদের কর্মশক্তি পরীক্ষা করে নেওয়া সঠিক, কারণ শান্ত ঘোড়াগুলিও রথবাহনের কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর কখনও কখনও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

দেওয়ানি ব্যবস্থাবিধি প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলেছেন,

(১) বাদী ও প্রতিবাদীর অর্থাৎ অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের আবেদন ও প্রত্যুত্তর বিচারের প্রয়োজনে বিচারকেরা লিপিবদ্ধ করবেন; সাক্ষীদের সাক্ষ্য বচন শুনবেন এবং প্রয়োজনমতো ধর্মশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রের বিধি বা ব্যবহার বিধি, দেশাচার, লোকাচার নজির হিসেবে রাজ্যশাসন ও রাজাজ্ঞার পর্যালোচনা করে বিচারকেরা দণ্ডপ্রণয়ন ও অর্থ নির্ণয় করবেন। উষণা, মনু বা বৃহস্পতির মতাবলম্বীরা কূটসাক্ষী বিষয়ে যা বলেছেন কৌটিল্যের তাতে সায় নেই। তিনি ধ্রুবসাক্ষী অর্থাৎ নিশ্চিত বিষয়ের বক্তাকেই বিচারালয়ে বিচারকদের সামনে সাক্ষী দিতে হাজির করতে বলেছেন। সত্য জেনেও যেসব সাক্ষী আদালতে ডাকা সত্ত্বেও হাজির হবে না কৌটিল্য তাদের ২৪ পণ দণ্ড বিহিত করতে বলেছেন। কূট বা কপট সাক্ষীদের উপর ১২ পণ দণ্ড আরোপ করা যেতে পারে বলে তাঁর অভিমত।

(২) দেওয়ানি ব্যবহার নির্ণয়ে কৌটিল্য স্বীকৃত বিষয়গুলি: অন্যতম হল বিবাহ বিধি, বাস্তু সম্পর্কিত বিবাদ, সময় বা চুক্তি ভঙ্গ, ঋণ দান ও গ্রহণ সংক্রান্ত মামলা, কেনা-বেচা সংক্রান্ত বিবাদ, সমবায়িক কাজকর্মের বিধান, দত্তদ্রব্যের অপ্রদান ও মালিকানা দ্রব্যের বিক্রি, দ্রব্যের মালিকানা নির্ণয়, দাস ও শ্রমিক সংক্রান্ত নিয়মাদি, দস্যুবৃত্তি, অপবাদ, মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন। সে যুগেও নারীর অধিকার রক্ষা, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিরোধ, কর ফাঁকি, ঋণ অপ্রদান, শ্রম সংক্রান্ত বিরোধ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইন আদালতে এসেছে এটা রীতিমতো বিস্ময়ের।

(৩) অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ অপরাধ সম্পর্কিত দণ্ডবিধির কথাও কৌটিল্য বলেছেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল : অন্যের গৃহে অতর্কিতে প্রবেশ; নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে কোনো বস্তু দেবার প্রতিজ্ঞা করেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ; দেবকার্যে বা পিতৃকার্যে শাক্যভিক্ষু, শূদ্র ইত্যাদিদের নিমন্ত্রণ; ওষুধ প্রয়োগে দাসীর গর্ভপাত; বনে বা লোকালয় বর্জিত স্থানে আত্মীয় পরিত্যাগ; ভ্রাতৃবধূকে অপমান (হাত ধরে টেনে আনা); অবৈধ দ্রব্যের বিক্রয়।

(৪) কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দেওয়ানি ব্যবহারবিধির উল্লেখ এক্ষেত্রে একান্ত প্রাসঙ্গিক :

* পরোক্ত সংক্রান্ত অপরাধ হল মূল বিষয়কে উহ্য রেখে বাদী বা প্রতিবাদীর অন্য বিষয়ের অবতারণা; আগেকার বিবৃতির সঙ্গে বর্তমান বিবৃতির অমিল; নিষেধ সত্ত্বেও তৃতীয় ব্যক্তির মতামত আহ্বান; কোনো প্রশ্নের উত্তরদান কালে হঠাৎ বিরত থাকা; অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা; সাক্ষীর সঙ্গে গোপন কথাবার্তা। এই ধরনের অপরাধের জন্য উপযুক্ত জরিমানা ধার্য হবে।
* পতির মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী যদি অন্য পতি গ্রহণ করে তবে পতির দায়ভাগ সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকবে না কিন্তু সংযত জীবনযাপন করতে পারলে সে তার স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। পুত্রবতী বিধবা স্ত্রী পতি গ্রহণ করলে সে তার স্ত্রীধন থেকে বঞ্চিত হবে। পুত্রহীনা বিধবা স্ত্রী পাতিব্রত্য রক্ষা করে চললে স্ত্রীধন ভোগ করতে পারবে।
* পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী বিবাহবন্ধন লাভ করতে পারবে না। একইভাবে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যত রাগ বা দ্বেষ থাকুক স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। ব্রাহ্ম, প্রজাপতি, আর্য ও দৈব এই চার প্রকার বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ত্যাগ বিহিত হবে না।
* বারো বছরের স্ত্রী ও ষোলো বছরের পুরুষ আইন-কানুনের অধীনে আসার যোগ্য। এই বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পর আইনের অবাধ্য হলে স্ত্রীর ১৫ পণ ও পুরুষের ৩০ পণ জরিমানা হবে।

* ম্লেচ্ছ বা অনার্য জাতির কোনো লোক নিজের সন্তান বিক্রি করলে বা বন্ধক রাখলে দোষের নয়, কিন্তু আর্যগণের দাসভাব সমাজে অচল।
* সংঘভুক্ত ব্যক্তিরা চুক্তি মেনেই বেতন বা আয় ভাগ করে নেবেন।
* যে ব্রাহ্মণ শত গাভীর মালিক হয়েও অগ্নির ধ্যান করেন না, যে ব্যক্তি সহস্র গাভীর মালিক হয়েও যজ্ঞ করেন না, যে ব্যক্তি শূদ্র মহিলাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন, যে ব্যক্তি গুরু পত্নীর সঙ্গে ব্যাভিচার করেন, যে ব্যক্তি অসৎ মানুষের কাছ থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ করেন তাঁরা যজ্ঞ করলে সমাজে কর্মসঙ্কর উপস্থিত হবে এবং এঁরা দণ্ডনীয়।
* মিথ্যাচারীরা পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী হলেও দণ্ডের যোগ্য, কারণ এর ফলে ধর্ম অধর্ম দ্বারা আহত হয়।

দেওয়ানি অপরাধের জন্য **দণ্ডদানের যেসব পদ্ধতির** কথা কৌটিল্য বলেছেন তার মধ্যে প্রধান হল জরিমানা। এই জরিমানাকেও আবার তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যে-কোনো অপরাধের জন্য সাধারণ বা মৃদু জরিমানা হল ৪৮-৯৬ পণ (সাধারণত রৌপ্য মুদ্রা)। মাঝারি দণ্ডের ক্ষেত্রে জরিমানা হল ২০০-৫০০ পণ। চরম দণ্ডের ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণ অবশ্যই বেশি। তবে যারা কুকর্মের সহচর তাদের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মৃদু জরিমানা ধার্য হয়েছে। এছাড়া যারা কুকর্মের সঙ্গে লিপ্ত নয় অথচ এই কাজ দেখেছে বা শুনেছে কিন্তু প্রকাশ করেনি তাদের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ অপরাধীর জরিমানার অর্ধেক ধার্য হয়েছে। দেওয়ানি বিধি ভঙ্গের জন্য শুধু জরিমানাই নয়, জরিমানার সঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ডেরও সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য। বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী প্রত্যেকের সামান্য ভুলভ্রান্তিও জরিমানাযোগ্য অপরাধ। সঠিক দণ্ডদানই হল ন্যায়দণ্ড এবং কৌটিল্যের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ন্যায় বিচারের দ্বারা প্রজাকে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম। ন্যায় বিচার যদি রাজাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন না করতে পারে তবে সে ন্যায়বিচারের কোনো মূল্য নেই।

কৌটিল্য আইনের চারটি অঙ্গের কথা বলেছেন—ধর্ম, ব্যবহার, ইতিহাস এবং রাজাজ্ঞা। এই চারটি অঙ্গ স্থির করে আইন কীভাবে কোন্ পথে চলবে। এক্ষেত্রে প্রথম অঙ্গটির তুলনায় পরেরটি কৌটিল্যের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। ধর্ম বলতে কৌটিল্য বুঝেছেন নিত্য সত্য, যার বিশ্বের উপর প্রবল প্রভাব আছে। ব্যবহার হল সাক্ষ্যপ্রমাণ। ইতিহাস জনগণের ঐতিহ্য মেনে স্থির হয়। আর রাজাজ্ঞা হল রাজার ন্যায়দণ্ড। এই ন্যায়দণ্ডের স্থানই সবার উপরে। রাজা যদি ধর্ম, ব্যবহার, ইতিহাস, এবং ন্যায় মেনে বিচার করেন তবে তিনি সমস্ত বিশ্ব জয় করতে পারবেন। ইতিহাস ও ধর্মের বিরোধে ধর্মই গুরুত্ব পাবে, কিন্তু শাস্ত্রের আইনের সঙ্গে যদি যুক্তির আইনের বিরোধ বাধে তবে যুক্তির আইনই গ্রহণযোগ্য হবে। কৌটিল্যের এই ধারণা ধর্মশাস্ত্রের প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধী।

আইন ও শাস্তিবিধানের প্রসঙ্গে বা প্রশাসনিক ন্যায়ের প্রশ্নে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুধরনের আইন ও ব্যবহার বিধির উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় অধিকরণে দেওয়ানি মামলা-মোকদ্দমার কথাই বলা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের চতুর্থ অধিকরণে কৌটিল্য সরাসরি ন্যায় বিচারের প্রশ্নে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের (কণ্টকশোধন) প্রশ্ন নিয়ে ভেবেছেন। সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষতিকর কাজকর্ম এবং অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শোধন ও সংস্কারের কথা এসেছে এই আলোচনায়। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় অংশের সাথে চতুর্থ অংশের (অধিকরণ) পার্থক্য হল প্রথম ক্ষেত্রে প্রধানত সাধারণ দেওয়ানি মামলা ও বিচার প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে রাজকীয় অমাত্যদের সাহায্যেই এবং আইনে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরামর্শ মেনেই বিচারকার্য সম্পাদন হবে। ফৌজদারি মামলায় রাজার নেতৃত্বে প্রশাসনিক আদালত কীভাবে সমাজের কণ্টক সরাবেন তার উপায় নির্ধারিত হয়েছে। সব রকমের জটিল মামলা-মোকদ্দমা ও গুরুতর অপরাধের শাস্তির কথা এই প্রসঙ্গে এসেছে।

কণ্টকশোধন বলতে কৌটিল্য যা বুঝেছেন তা হল দেশের শান্তির ও সমৃদ্ধির পথে যেসব কাঁটা বা বাধা আছে তার অপসারণ। তিনজন কমিশনার (প্রদেষ্টা) ও তিনজন মন্ত্রী নিয়ে রাজার নেতৃত্বে গঠিত সংস্থা কণ্টকশোধনের বিষয় নির্ধারণ করবেন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে আছে : (১) কারিগর, তন্তুবায়, ধোপা, স্বর্ণকার,

মেথর, চিকিৎসক, গায়ক ও বাদ্যকরের রাষ্ট্রবিরোধী বা প্রজাবিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে সর্তকতা; (২) প্রবঞ্চক বণিকদের হাত থেকে প্রজার রক্ষা; (৩) অগ্নি, প্লাবন, মড়ক, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মুষিক, হিংস্র জন্তু ও প্রেতাত্মার বিপদ বা উপদ্রব থেকে রক্ষা; (৪) গুপ্তচরদের অনিষ্ট থেকে প্রজার রক্ষা; (৫) অসৎ জীবনযাপন থেকে প্রজাকে প্রতিরোধ; (৬) যুবকদের ফৌজদারি অপরাধ দমনের ব্যবস্থা; (৭) সন্দেহজনক গতিবিধি, চোরাই দ্রব্য গ্রহণ ও রক্ষণসংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি; (৮) আসন্ন মৃত্যু বা হঠাৎ মৃত্যুজনিত পরিস্থিতি; (৯) প্রশাসনের নানা স্তরের কর্মচারীদের হাত থেকে প্রজার রক্ষা; (১০) অপরিণত বালিকার সঙ্গে যৌন সংসর্গ রোধ; (১১) ন্যায় ও ধর্মবিরোধী অন্যান্য অসৎ কাজকর্মের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

ন্যায় লঙ্ঘনের নানা দৃষ্টান্ত কৌটিল্য উপস্থিত করেছেন : অসিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণে ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য বর্ণের মানুষকে বাধ্য করা; অন্যের গৃহে অতর্কিতে বা বলপূর্বক প্রবেশ; অস্ত্র নিয়ে অন্যের বাড়িতে প্রবেশ; ভিক্ষুক, পথিক, উন্মাদের অন্যের গৃহে প্রবেশ; মধ্যরাত্রে নিজের বা অন্যের ছাতে ওঠা; বণিকের অর্থ বা দ্রব্য চুরি করা; গ্রাম, বন বা চারণক্ষেত্র ধ্বংস; বিপজ্জনক গৃহ নির্মাণ; বাঁধ ভেঙে ফেলা; গাছ কাটা; কাদা, লাঠি, পাথর ছোড়া; হাতি বা কোনো জন্তু দ্বারা মানুষ বধ; দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত জন্তুর বধ; ক্ষতিকর মায়া বা জাদু; অচেতন মানুষ পশু বা দেবতার সঙ্গ কামনা; সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সংসর্গ; স্ত্রীলোকের উপর অন্যায় মায়াবিদ্যা প্রয়োগ; সহগামিতা ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য।

ফৌজদারি দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধ অনুযায়ী জরিমানা, নানা ধরনের নির্যাতন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা ছিল। তবে দণ্ডদানের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মানুষদের সুবিধা বা সুযোগ ছিল বেশি। কোনো ব্রাহ্মণকে প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা দেবার কথা কৌটিল্য বলেননি। তবে অপরাধ অনুসারে ডুবিয়ে মারা, দ্বীপান্তর বা খনিতে কঠোর শ্রমদানের শাস্তির ব্যবস্থা তাঁদের ক্ষেত্রে ছিল। প্রতিটি বর্ণের মানুষকেই অপরাধ অনুসারে চরম, মধ্য বা মৃদু জরিমানা করা হত তবে শূদ্রের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ছিল কম। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অবৈধ যৌন সংসর্গ, অসিদ্ধ খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা, অর্থ অপহরণ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির হানি ইত্যাদির জন্য ছিল চরম দণ্ড। বিপজ্জনক গৃহ নির্মাণের জন্য ছিল জরিমানা, অপমান, গঞ্জনা, ঋণ অনাদায়, মালিকানাহীন দ্রব্যের বিক্রি, দস্যুবৃত্তি, আক্রমণ, মানহানি, জুয়াখেলা বা বাজি ধরা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাৎক্ষণিক হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। যে-কানো রকম শারীরিক আঘাত ও গুরুতর অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গহানি, ডুবিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা, ষাঁড়ের মুখে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। হত্যাকারীকে সাহায্য করা ছিল গুরুতর অপরাধ। পিতৃ বা মাতৃ হত্যাও গুরুতর অপরাধ। রাজার পারিষদবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা গুরুতর অপরাধ। বন্দির উপর অন্যায় পীড়নের জন্য বন্দিশালার অধ্যক্ষকে জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড ছিল অপরাধীর জিভ ছেদন।

কণ্টকশোধন পর্যায়ের আলোচনায় কৌটিল্য এই মতবাদ প্রচার করেছেন যে রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্পর্ক পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের মতো। প্রজার মনে ভয় উপস্থিত হলে ভয় পীড়িত প্রজাকে রাজা পিতার মতো রক্ষা করবেন। গুপ্তচর বা অন্যান্য ব্যক্তির কৌশলে অপরাধী ধরা পড়লেও কৌটিল্য এই মতই প্রচার করেছেন রাজা সর্বজ্ঞ, তিনি সমাজের কণ্টক কারা তা জানেন এবং তাঁর আদেশেই চোরেরা ধরা পড়েছে এবং আবার ধরা পড়বে। সুতরাং অপবাদ বা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে তাদের পরিজনবর্গের এগিয়ে আশা উচিত। কৌটিল্য ব্রাহ্মণদের ফৌজদারি অপরাধের জন্য পীড়ন করা চলবে না একথা বললেও তাঁদের অপরাধের জন্য নানারকম ললাট চিহ্ন অঙ্কন করে অপরাধের চিহ্ন রাখার কথা বলেছেন। চুরি করা বা হত্যা করা বা ব্যভিচারদোষে ব্রাহ্মণদের ললাট চিহ্ন এঁকে দিয়ে তাঁদের অপরাধের কথা সর্বসমক্ষে জানানো এবং তাঁদের রাজ্য থেকে নির্বাসন বা খনি অঞ্চলে বাস করার শাস্তিদানের কথা বলেছেন কৌটিল্য। দণ্ডবিধান কাজে রাজার যদি ভুল হয় অর্থাৎ দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে যদি তিনি দণ্ড দেন তবে তার উপর ত্রিশগুণ দণ্ড ধার্য হবে এবং এই দণ্ডের ধন জলে বরুণদেবের উদ্দেশ্যে প্রদান করতে হবে এবং তার পর তা ব্রাহ্মণদের দান করতে হবে। এই দান দ্বারা রাজার দণ্ডদানের ভুলত্রুটি শোধন হয় এবং এক্ষেত্রে বরুণদেবই হলেন রাজার শাসক। রাজধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য রাজা 'তীক্ষ্ণ' নামক

গুপ্তচরের সহায়তায় প্রয়োজনে মহামাত্রদের অপরাধ জানবেন এবং গোপনে তাঁদের বধদণ্ড দেবার আদেশ দিতে পারেন। যেসব মহামাত্র একসঙ্গে মিলিতভাবে রাজাকে আঘাত বা ধ্বংস করতে উদ্যত হন তাঁদের গোপনে হত্যা করার কঠিন শাস্তি রাজা প্রয়োগ করতে পারেন বলে কৌটিল্য মতপ্রকাশ করেছেন, কারণ প্রকাশ্যভাবে এঁদের দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও দণ্ডবিধান পদ্ধতি ভারতীয় অপরাধবিধি ও দণ্ডবিধিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। দণ্ডদানের নিষ্ঠুর প্রথাগুলি পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হলেও আইন ও আদালত ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি রহিত করা হয়। তবে আমাদের দেশের পুলিশি প্রশাসনে অপরাধীকে অপরাধ কবুল করার জন্য এখনও যেসব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রথা আছে সে দিকে দৃষ্টি দিলে কৌটিল্যের দণ্ডবিধান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির প্রভাব যে আজ একেবারেই নেই সে কথা বলা চলে না। দেওয়ানি বিধি বিষয়ে কৌটিল্যের ধারণা বা দেওয়ানি মামলা ও তার সাক্ষ্য বিষয়ে কৌটিল্যের মতামত বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। বিবাহবিধি, বাস্তুসংক্রান্ত সমস্যা, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের তহবিল তছরুপের সমস্যা, ঋণ বা কর আদায়, কেনা-বেচা সংক্রান্ত বিরোধ, বস্তুর মালিকানা, অবৈধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অবশ্যই তার এক মডেল হিসেবে গৃহীত হতে পারে। ন্যায় বিচারের এমন সুঠাম, সুশৃঙ্খল ও কঠোর ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রের সংহতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হতে পারে সমকালের রাজারা সেটা পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কৌটিল্যের দণ্ডনীতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করেছেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট অশোকও আইন ও বিচারকার্য সংগঠনে অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রের মডেলটিকেই ব্যবহার করেছেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় মৌর্য আমলের কঠোর দণ্ডনীতির জন্যই চুরি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদির ঘটনা সেই যুগে ছিল না বললেই চলে। নৈতিক ও সামাজিক বিধি লঙ্ঘনের নজিরও তেমন একটা লক্ষ করা যায় না।

৩. সৈন্যবাহিনীর গঠন ও ভূমিকা : কৌটিল্যের দণ্ডনীতির প্রধান শক্তি দণ্ডধারী রাজা এবং দণ্ড ও শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হলেও সৈন্যবাহিনীই যে দণ্ড প্রয়োগের হাতিয়ার এবং প্রধান কেন্দ্র সে কথা বুঝাতে কৌটিল্য তাঁর রাষ্ট্রের সাতটি প্রকৃতির অন্যতম হিসেবে দণ্ড অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর কথা বলেছেন। দণ্ডশক্তি, সৈন্যবাহিনী, কৌটিল্য যাকে বলেছেন উৎসাহশক্তি, একই সঙ্গে রাজার তথা রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। উপযুক্ত প্রহরী, সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবৃত্ত হয়েই রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।[৪৪] সৈন্য হবে সুবংশজাত, শক্তিশালী, অনুগত, পারিবারিক শঙ্কামুক্ত, অজেয় সহনশীল ও দণ্ড ব্যবহারে পারদর্শী। প্রধানত ক্ষত্রিয়রাই সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হবে। অর্থশাস্ত্রের পঞ্চম অধিকরণে দণ্ডশক্তির বাহক সৈন্যবাহিনীর গঠন ও ভূমিকা সম্পর্কে কৌটিল্য বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন।

সৈন্যবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে না পারলে দণ্ডদান ব্যবস্থাই ব্যর্থ হবে একথা ভেবেই কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রের জন্য এক বিশাল, সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সুপারিশ করেছেন। পদাতিক, রথ, অশ্ব ও হস্তিবাহিনী—সৈন্যবাহিনীর এই চারটি অংশ রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখতে সবসময় প্রস্তুত থাকবে। নন্দ রাজার সেনাবাহিনীর চেয়ে চন্দ্রগুপ্তের বাহিনী যে সংখ্যায় ও শক্তিতে বিরাট ছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। রথের সংখ্যা জানা না গেলেও মৌর্য আমলে ৬,০০,০০০ পদাতিক সৈন্য, ৯,০০০ হাতি, ৩০,০০০ অশ্ব যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বের কথা ভেবেই রাষ্ট্র তাদের আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছে। সৈন্যবাহিনী ১০ জনের দল, ১০০ কোম্পানি, ১,০০০ যোদ্ধা বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়, যুদ্ধ কার্যালয়, কমিশন, বোর্ড ইত্যাদি ছিল। বোর্ডগুলি নৌ, রথ, অশ্ব, পদাতিক ও হস্তিবাহিনীর তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। হস্তি, রথ, অশ্বের সজ্জা বিষয়ে, অস্ত্রধারণ ও সৈন্যসংখ্যা বিষয়ে রাজাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়েছে। মৌর্য রাষ্ট্রে যুদ্ধের প্রয়োজনে হাতির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কৌটিল্যের উপদেশ রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতের মাধ্যমে যোদ্ধাবাহিনীকে উৎসাহিত করবেন। সৈন্যদের প্রতি তাঁর উপদেশ, রাজার প্রয়োজনে তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, যুদ্ধ থেকে

বিরত থাকা মহা অপরাধ। সৈন্যের শক্তিতেই সার্বভৌমিকতা সুরক্ষিত হবে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য পরিপূরণের (সম্পত্তি অর্জন ও নিরাপত্তা) সুযোগ থাকবে।

দণ্ডনীতি অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রের শক্তি ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও এটি ধর্মশাস্ত্র ঐতিহ্যের বিরোধী বলে সমালোচকেরা মনে করেন। আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার হাতিয়ার বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হলেও দণ্ডনীতির কঠোর প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই অমানবিক ও হীন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের চোখে কৌটিল্যের দণ্ডনীতি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অন্যায্য মনে হয়েছে। শাস্তির যে নিষ্ঠুর প্রথা কৌটিল্য চালু করেছিলেন অশোকের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় তা গৃহীত হয়নি। এছাড়া অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্র আইনের অনুশাসন মেনে, সাম্যের নীতি মেনে শাস্তির নিয়মকে প্রয়োগ করেনি বলে অভিযোগ। উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে এই আইনের ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। দণ্ডনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৌটিল্য সাম্যের নীতির চেয়েও বেশি প্রভাবিত হয়েছেন কূটনীতি দ্বারা। রাষ্ট্রের স্বার্থে কূটনীতির প্রয়োগ ঘটেছে, প্রজা ও নাগরিকের স্বার্থে সাম্যের নীতির ন্যায্য অনুসরণ ঘটেনি।

কৌটিল্যের দণ্ডনীতির মধ্যে কেউ লক্ষ করেন ম্যাকিয়াভেলীয় ছলচাতুরী ও কূটকৌশলের বৈশিষ্ট্য, আবার কেউ কেউ তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেন হবসবাদী সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রদর্শনের সূত্র। পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি যেমন নীতিহীনতাকেই রাজনীতির পক্ষে সুবিধাজনক ভেবেছেন, বলপ্রয়োগ বা পাশবিকতার পন্থাকে আইনের চেয়েও অধিক গ্রহণযোগ্য পন্থা ভেবেছেন। কৌটিল্যও তেমনি রাষ্ট্রের শক্তি ও স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পাশবিকতার নীতি অধিক কার্যকর মনে করেছেন। কৌটিল্যের মধ্যে রাজনৈতিক হতাশা থেকেই ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছিল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক প্রবণতা। দণ্ডনীতি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার, কুটিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের এক নির্লজ্জ প্রকাশ। কৌটিল্যের রাজভক্তিকে দেশভক্তির সঙ্গে মেলানো যায় না। কারণ, নিরপেক্ষ, সংস্কারমুক্ত হয়ে তিনি অগ্রসর হননি। এক ধরনের অবিশ্বাস, আতঙ্ক, অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তত্ত্বে। দণ্ডনীতির প্রণেতাকে আইনের উদার রক্ষক হিসেবে নয়, আমরা লক্ষ করি আইনের এক কপট কৌঁসুলি হিসেবে।

রাজনীতিতে হবসবাদ বলতে আমরা বুঝি রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল, আধিপত্যের লক্ষণযুক্ত এক মতবাদ। বাস্তববাদী বা যুক্তিবাদী বলে পরিচিত হলেও ইংরেজ রাষ্ট্র দার্শনিক হবস সমকালের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে বুঝতে চাননি। রাজকীয় কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারের শক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল বেশি, মানুষের অধিকার বা আইনের রাজ্যের প্রতি ততটা নয়। পশ্চিমি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হবস-এর সঙ্গে বহুকালের পূর্ববর্তী ভারতীয় চিন্তাবিদ কৌটিল্যের মিল লক্ষণীয়। সংস্কারবাদের চেয়ে রক্ষণশীলতা তাঁর অধিক পছন্দ। সাম্যের বাণী নয়, কর্তৃত্বের দণ্ডে তাঁর আস্থা বেশি। সমকালের বৌদ্ধধর্মের মানবিক ও গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রসার তাঁর পছন্দ ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু ভাবনাকেই আইন ও ক্ষমতার বর্ম পড়িয়ে আরোপ করতে চেয়েছেন তিনি। কৌটিল্যের চিন্তায় হিন্দু নৈতিকতা ও উদারবাদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে—দণ্ডের কাছে ধর্মের শক্তি পরাভূত হয়েছে। হবসের মতো কৌটিল্য সমকালের ধর্মীয়, রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। হবসের মতো কৌটিল্য সর্বক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকে উপস্থিত করেন এবং এর সমর্থনে চুক্তির ধারণাকে ব্যবহার করেন। হবসের মতোই কৌটিল্য স্পষ্টভাবে অনিয়মের রাজ্য থেকে বাঁচতে নিয়মের রাজ্য, চরম রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সৃষ্টি ও বাঁচিয়ে রাখবার অঙ্গীকার করতে বলেন মানুষকে।

সমালোচনা যাই হোক না কেন কৌটিল্য তাঁর দণ্ডনীতির আড়ালে হিন্দু নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছেন, রাজনীতির মানদণ্ডে অন্য সমস্ত মানবিক ভাবনাকে বিসর্জন দিয়েছেন, কর্তৃত্ব, কূটনীতি এবং কৌশলের ফাঁদে রাজনীতিকে বন্দি করেছেন একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কৌটিল্যের দণ্ডনীতিকে সমকালের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই বিচার করতে হবে, ম্যাকিয়াভেলি বা হবসের সঙ্গে তুলনাও এক্ষেত্রে সঠিক নয় বলেই অনেক গবেষক মনে করেন। কৌটিল্য দণ্ডনীতি বলতে বুঝেছেন সেই উচ্চমার্গের রাজনীতিকে যা রাজাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, ধর্মকে সত্য পথে স্থাপন করে, সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে। কৌটিল্যকে বিচার করতে ম্যাকিয়াভেলি, হবসের চিন্তা নয় বা গান্ধি ও টলস্টয়ের আদর্শ নয়, আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে সমকালের পরিস্থিতির দিকে। এক

বিক্ষুব্ধ, প্রতিকূল, অস্থির সামাজিক পরিস্থিতিতেই কৌটিল্যকে কলম ধরতে হয়েছিল, রাষ্ট্রশাসনের এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করতে হয়েছিল। গবেষকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে যুগে কৌটিল্য লিখেছেন সেই যুগের তুলনায় তাঁর চিন্তা যথেষ্ট উন্নত ছিল। আইন ও বিচার পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর কিছু সুপারিশ শুধুমাত্র তাঁর যুগের বিচারেই নয়, পরবর্তী সময়ের বিচারেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে।